দুর্নীতি - সেলিনা হোসেন

(ছোটগল্প)

ইমদাদুল হক মিলন-এর দুই বাংলার দাম্পত্য কলহের শত কাহিনী থেকে সংকলিত

PDF by BDebooks.Com

দুর্নীতি – সেলিনা হোসেন

নিয়ামত রসুল যতদিন একা ছিলো ততদিন তার জীবনযাপনের ভাবনা ছিলো এক ধরনের। বিয়ের পরে দুমাস না যেতেই ওর মনে হচ্ছে ও অন্যরকম মানুষ হয়ে গেছে। বউয়ের সঙ্গে জড়িত জীবন যেহেতু ওর একার নয়, সেহেতু ও এখন এক ধরনের অস্বস্তির মধ্যে দিনযাপন করছে। বিয়ের দুমাসের মধ্যেই বউ বলেছে, তোমার চাকরিতে উপরিপাওনা আছে বলেই এখানে বিয়েতে রাজি হয়েছি, নইলে রাজি হতাম না। আমার জন্য কত প্রস্তাব ছিলো আমি রাজি হইনি।

নিয়ামত রসুল একথা শুনে অস্বস্তিতে আফরোজার দিকে তাকায়। ওর গলা শুকিয়ে যায় বুকের কাছে কি যেন একটা এসে আটকে থাকে। আফরোজা ভুরু কুঁচকে বলে, কি হলো? অমন করছো কেন? আমার কথা শুনে তুমি ভয় পেয়েছো মনে হচ্ছে। খুব কি খারাপ কিছু বলেছি?

-ইয়ে, মানে, তুমি আমাকে ঘুষ নিতে বলছো?

—ঘুষ কেন হবে? ওটা একটা উপরিপাওনা। তোমার যোগ্যতার সম্মানী। পরিশ্রমের জন্য বাড়তি আয়।

নিয়ামত রসুল গলা নিচু করে কঠিন স্বরে বলে, এটা দুর্নীতি।

—দুর্নীতি? হো-হো করে হাসে আফরোজা। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স করেছে। বাবা পুলিশ অফিসার। আয়ের চেয়েও বাড়তি আয়ের প্রাচুর্য ছিলো বলে আয়েসেই জীবন কেটেছে। নিয়ামত রসুল বউয়ের হাসি শুনে বিব্রত মুখে চুপ করে থাকে। এটা যে হাসির বিষয় হতে পারে তাও কল্পনা করতেই পারে না। একবার ভাবে চেঁচিয়ে উঠে বলবে, এত হাসছো কেন? তোমার লজ্জা করে না হাসতে? কিন্তু বলা হয় না। ভয় করে, নিজের ভেতরে কুঁকরে যায়। পরক্ষণে নিজেকেই বলে, ভয়। কাকে? কিন্তু বুঝতে পারে না অদৃশ্য সুতোর টানটা কোথায়। এই না বুঝতে পারাই ওর এখন সবচেয়ে বড় সমস্যা। আসলে ও বুঝতে পারছে ভয়টা ধ্বস নামার। স্কুল শিক্ষক বাবা চাকরি শুরুতেই বলে দিয়েছিলো, বাবা সৎ উপার্জন খাওয়াবি। হারামের টাকা আমাদের জন্য না। ওটা আমরা ছুঁতে চাই না। এখন স্ত্রী অন্য জীবনের কথা বলছে। যে জীবনে ঢুকলে বাবা-মায়ের কাছ থেকে শেখা নিজেরও বিশ্বাস ধ্বসে পড়বে। নিয়ামত রসুল স্ত্রীর তীব্র দৃষ্টির সামনে বিষণ্ন হতে থাকে। ওই দৃষ্টি ওর ভেতরে ঢুকলে ও চোর হয়ে যায়, বেরিয়ে এলে পুলিশ হয়। আফরোজা খেকিয়ে উঠে বলে, কি হলো তোমার?

—খেলছি।

–খেলছো? কার সঙ্গে?

–নিজের সঙ্গে।

—কিভাবে?

–বুঝবে না।

–বললে, আমিও খেলতাম।

—ওই খেলার সাধ্য তোমার নেই।

—খেলাটার নামটা বলো না?

—চোর-পুলিশ?

—চোর-পুলিশ? হো-হো করে হেসে ওঠে আফরোজা।

—চোর পুলিশ হতে পারে না, কিন্তু পুলিশ চোর হয়, তখন কিভাবে খেলবে? আফরোজা রেগে গিয়ে বলে, তুমি আমাকে অপমান করছো।

—আশ্চর্য, তুমি অপমান বোঝ?

এবার হো-হো করে হেসে ওঠে ও। মনে হয় সমস্ত বিষণ্নতা কেটে গিয়ে ও নিজের মধ্যে ফিরে এসেছে। খেলায় ওর জিৎ হয়েছে। আফরোজা দুপদাপ পা ফেলে। অন্য ঘরে চলে যায়। নিয়ামত

রসুল হাসতে হাসতে ভাবে, এভাবেই কি এ জীবনের রঙ দেখা শুরু হলো! ও দাঁতে ঠোঁট কাটে। হাসি এখন সারা ঘরে। দেয়াল থেকে, আসবাবপত্র থেকে হাব্বি ধ্বনি আসছে। নিয়ামত রসুল বাইরের পৃথিবী দেখবে বলে জানালার কাছে এসে দাঁড়ায়। জানালার শিকগুলো ভীষণ ঠাণ্ডা।

রদিন অফিস থেকে বাড়ি ফিরতে ভয় করে নিয়ামত রসুলের। অফিসে লাঞ্চ করার সময় থেকেই বিষয়টি ওকে আক্রান্ত করে। এক লোকমা ভাত গেলার সঙ্গে সঙ্গে মনে হয় সেটা বুকের ভেতরে আটকে গেছে এবং পরক্ষণে মনে হয় ওর শ্বশুর ওর ভেতরে ঢুকেছে। পুলিশ ভাবলেও তার মুখটা ভেসে ওঠে, চোর ভাবলেও তার মুখটা ভেসে ওঠে। ও ভাত খেতে পারে না। ওই এক লোকমা ভাত বুকের ভেতরে নিয়ে হাত গুটিয়ে বসে থাকে। প্লেটে পড়ে থাকে করলা ভাজি, কৈ মাছ আর লাউ ডালের চচ্চড়ি। কোনোটাই আফরোজার রান্না নয়, কাজের মেয়ের।

শেষ পর্যন্ত বাড়ি ফিরতেই হয়। আফরোজার মেকি হাসি ওকে আরো ম্রিয়মাণ করে দেয়। ও সহজ হতে পারে না। মনে হয় আফরোজা জণ্ডিসের রোগী, চোখের গভীর কোটরের ভেতর থেকে তাকিয়ে থাকে। ঘামতে থাকে নিয়ামত রসুল। ওর ঘাম দেখে রেগে যায় আফরোজা। চেঁচিয়ে বলে, কেমন সে বিদঘুঁটে গন্ধ তোমার ঘামে। কাছে এসে দাঁড়াতেও ঘেন্না হয়।

—ইয়ে, দাঁড়াও,গোসল করে আসি।

ও জুতোটা খুলে ঘরের একপ্রান্তে ছুঁয়ে ফেলে বাথরুমে ঢোকে। দরজায় পিঠে ঠেকিয়ে বড় করে শ্বাসটেনে বলে, এটা পালানোর একটা দারুণ জায়গা।

কিছুক্ষণ এভাবে কাটিয়ে ও সাওয়ারের নিচে এসে দাঁড়ায় মনে হয় দূর থেকে কেউ ওকে শান্ত হতে বলছে, বলছে স্থির হতে। কিন্তু হয় না। ভেত্রটা যেমন ছিলো তেমনই থাকে।

দরজায় শব্দ করে আফরোজা।

—আর কতক্ষণ? বের হও না?

শব্দ করে না নিয়ামত রসুল। ঘাপটি মেরে থাকে। বাথরুমের ছোটঘরে শুধু জল পড়ার শব্দ। বাইরে আফরোজার কণ্ঠস্বর।

–শুনছো? কি হলো? আর কতক্ষণ?

—আসছি।

নিয়ামত রসুল সাওয়ারের ট্যাপ বন্ধ করে। গা মোছে। লুঙি পরে এবং খানিকটা ভেজা শরীর নিয়ে বেরিয়ে আসে। ভাবে, শরীরটা জলে আর ঘামে মাখামাখি হলে আর কটু গন্ধ বের হবে না। বুকের

ভেতরে স্বস্তি নিয়ে বের হতে গিয়ে থমকে দাঁড়ায়, কি অদ্ভুতভাবে বেঁচে থাকার পথ খুঁজছে ও। কেমন স্বাভাবিক নিয়মে পন্থা এসে যাচ্ছে চিন্তায় এর জন্য কোনো আগাম ভাবনা ভাবতে হচ্ছে না। নিজেকেই বললো, এমনটি হওয়ার কথা ছিলো না, লু হলো। আশ্চর্য, বুকের ওপর আঙুল বুলিয়ে দাগ টানলো। কিছু একটা খুঁজতে চাইলে নিজের ভেত্র। দোষটা কি ওর না দুলাভাইয়ের? দুলাভাইতো তার মামাতো বোনের জন্য ওকে পছন্দ করতেই পারে! আসলে দায়িত্বটাতো ওর নিজেরই ছিলো। ও নিজেই সিদ্ধান্ত নিতে ভুল করেছে এখন আর কাউকে দোষারোপ করা যাবে না। আফরোজাকে দেখে আপত্তি করে নি ও। ভেবেছিলো বিয়ে হলে সব ঠিক হয়ে যাবে। স্টুপিড, নিজেকে গাল দিয়ে দরজা খোলে। আফরোজা নেই। হয়তো বেডরুমে। ও ভেজা তোয়ালে হাতে নিয়ে বারান্দায় আসে। দড়ির ওপর ভোয়ালেটা মেলে দিয়ে ভোয়ালের এক প্রান্তে মুখ গোঁজে। সুগন্ধি আসছে তোয়ালে থেকে? হয়তো ভোয়ালেটা আফরোজা ব্যবহার করেছিলো। শুনতে পায় অদৃশ্য কণ্ঠ: নিয়ামত রসুল জীবন সম্পর্কিত ভাবনায় বেশ হিসেবি তোক। কি করা উচিত এবং কি করা উচিত নয় এটা ও ভালোভাবে যাচাই করে দেখার বাসনা রাখে। ছোটবেলা থেকেই ও এমন স্বভাব পেয়েছে। কার কাছ থেকে? মা না বাবা? নিয়ামত রসুল তা ভাবতে পারে না। কখনো মনে হয় দু'জনের কাছ থেকেই, কখনো মনে হয় ও নিজের ভেতর থেকে এই প্রেরণা গড়ে তুলেছে। এটাকে স্বশিক্ষাও বলা যেতে পারে।

নিয়ামত রসুল বাবা-মার দ্বিতীয় সন্তান। বড় বোনের চোদ্দ বছরের ছোট। বাবা মায়ের মাঝে বেশ কয়েকটি বাচ্চা হয়েছিলো, বাঁচে নি। ও বড় হওয়ার আগেই বোনের বিয়ে হয়ে যায়। প্রায় পিতৃতুল্য দুলাভাইয়ের প্রস্তাবটিতে ওর আছে আদেশের মতোই ছিলো প্রায়। বোগাস, এসব ভাবার কোনো মানেই হয় না। ও খুব একা একা বড় হয়েছে এটাই এখন মূল কথা। কথাটা হলো ওর একাকিত্ব। একা একা আপন মনে বড় হওয়া এজন্যই কি আফরোজার সঙ্গ মাঝে মাঝে ভালো লাগে না?

—কি হলো এখানে দাঁড়িয়ে আছো কেন? চা খাবে না? আজ তোমার জন্য একগাদা নাস্তা বানিয়েছি।

একগাদা?

—তাতো করবোই। শোন, আমি কিন্তু অল্প টাকায় সংসার চালাতে পারবো না। নিজেকে খুব ছোট মনে হয়।

আফরোজার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে ও সোজা বেডরুমে যায়। জামা গায়ে দেয়। চুল আঁচড়ায়। ডাইনিং টেবিলে এসে দাঁড়িয়ে বলে, দু'জনের জন্য এত খাবার! আমি তো শুধু চা খাবো।

—তো, এত কিছু কার জন্য বানিয়েছি?

আফরোজার কণ্ঠে ক্রোধ।

–নিয়ে খাও। আমি দিতে পারবো না।

আফরোজা চেয়ারের ওপর পা উঠিয়ে হাঁটুতে মুখ গোঁজে। নিয়ামত রসুল পট থেকে চা ঢালতে ঢালতে বলে, আমার সামর্থ্যের বাইরে কোনো কিছু আমি পছন্দ করি না।

আফরোজা ফোঁস করে উঠে চায়ের পটটা এক ধাক্কায় টেবিল থেকে ফেলে দেয়। সেটা টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে মেঝেতে গড়ায় চায়ের লিকার। নিয়ামত রসুলের বুকের ভেতরটা কেমন জানি করে। ও চায়ের কাপটা হাতে নিয়ে বারান্দায় আসে। কপালে ঘাম জমে। এ ধরণের আচরণের সঙ্গে ও অভ্যস্ত নয়। ও বুঝতে পারে একটু পরে ওর শরীর থেকে কটুগন্ধ বের হবে। ও চা খেতে পারে না। চায়ের কাপটা বারান্দার কোণায় রেখে দিয়ে ও বাইরে চলে আসে। ফুটপাত ধরে হাঁটতে থাকে। বেশ স্নিগ্ধ বাতাস বইছে। নিয়ামত রসুল প্রফুল্ল হয়ে ওঠে। এখন আরও ঘামছে না। পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এসেছে বলে আফরোজা দেখতে পায় নি। আফরোজা কি ওকে খুঁজছে? ও কি ওকে খোঁজার জন্য রাস্তায় নেমে এসেছে? নিয়ামত রসুল ফাঁক জয়াগায় দাঁড়িয়ে পড়ে পেছন ফিরে তাকাতে পারে না। দেখতে পায় শরীফ আসছে। ও পাশের ফ্ল্যাটে থাকে। অনেক দিনের পরিচয়। ও বোকার মতো দাঁড়িয়ে থাকে। শরীফ এসে ওর ঘাড়ে হাত রাখলে ও চমকে ওঠে। মনে হয় যেন, আফরোজা ওর ঘাড় খামচে ধরে বলছে, পালাচ্ছে কোথায়?

শরীফ অবাক হয়ে বলে, কি রে কি হয়েছে? তোকে ঠিক এ্যাবসেন্ট মাইন্ডেড প্রফেসরের মতো দেখাচ্ছে। চুপ করে আছিস যে? কি হয়েছে। কিছু একটা তো ভাবছিস। ভাবনাটা কি?

—ভাবনা?

নিয়ামত রসুল শরীফের মুখের দিকে তাকায়। দৃষ্টি স্থির হয়ে থাকে। শরীফের চোখের মণিটা মনে হয় সবুজ। ভুরু জোড়া কালো নয়।

–কি দেখছিস।

—তুই কি আজ নিজেকে দেখেছিস শরীফ?

–না, দেখা হয় নি।

—দেখলে বুঝতি তুই আর আগের শরীফ নেই।

—বোগাস। পুরনো কথা বলছিস। এসব বলে বিদ্যা ফলানো যাবে না। কি হয়েছে বল?

—তুই জিজ্ঞেস কর আমি কি আজ নিজেকে দেখেছি?

—আমার বোঝা হয়ে গেছে, দেখেছিস এবং বুঝতে পেরেছিস যে তুই আর আগের নিয়ামত নেই।

–এখন কি করবো?

—কি আর করবি? বাড়ি যায় আর বউয়ের পা ধরে মাপ চেয়ে নে।

—কেন? মাপ চাইবো কেন?

—ভুলটা তো তোরই।

কথাটা বলে শরীফ ওর পাশ কাটিয়ে হনহন করে চলে যায়। নিয়ামত রসুল রাস্তার পাশের রেনট্রি গাছের কাণ্ডে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থোকে। আশ্চর্য, ও ভেবেছিলো আফরোজার কথাটা ওকে কি বলা যায়, নাকি বলা উচিত হবে? সেই বিষয়টি শরীফ জানে। কেমন করে? কেন করে ওর চারপাশের মানুষের এমন ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় থাকে। ওর নেই কেন? নিয়ামত দু'হাত বুকের ওপর রেখে উত্তেজনা দমন করে চায়। পারে না। ওর হাঁটু কাঁপে। ও প্রাণপণে গাছের গুঁড়ির সঙ্গে নিজেকে সিঁটিয়ে রাখে। দেখতে পায় আফরোজা আসছে। আফরোজা একদম ওর মুখোমুখি এসে দাঁড়ায়। নিয়ামত রসুল দৃষ্টি অন্যদিকে সরাতে পারে না, সেটা আফরোজার চোখের ওপরই রাখতে হয়। আফরোজা গড়গড় করে কথা বলতে থাকে, কি ব্যাপার এখানে দাঁড়িয়ে আছো কেন? আমি তোমাকে সারা বাড়ি তন্নতন্ন করে খুঁজেছি। শেষে না পেয়ে ভাবলাম তুমি বোধহয় বাইরে গেছে। কখন বেরুলে বাড়ি থেকে? দেখলাম চা'ও খাও নি কাপটা বারান্দায় পড়ে আছে শরীর খারাপ লাগছে।

–হ্যাঁ।

–কই বলনিতো আমাকে? কি হয়েছে?

—ঘামছি।

—ঘামছো? ঘামলে আবার শরীর খারাপ লাগে নাকি? জানতাম না তো? কখনো শুনিওনি।

–তুমি তো কটু গন্ধ পাও।

—দূর এটা একটা কথা হলো, চলো বাড়ি চলো। তোমাকে আমি দামি পারফিউম দেবো। কোনো গন্ধ থাকবে না। পারফিউম দারুণ জিনিস। ব্যবহার করা শিখতে হয়। আমি তোমাকে এসব শেখাতে চাই। কত যত্ন করে তোমার জন্য খাবার বানিয়েছি, কিছুই খেলে না।

—আমার খিদে নেই।

–সেজন্য হাঁটতে বেরিয়েছে, তা বলবে তো? ঠিক আছে, চলো বাড়ি চলো।

—আমি কিছুক্ষণ হাঁটতে চাই।

—চলো, আমিও তোমার সঙ্গে হাঁটবো। তারপর দুজনে একসঙ্গে বাড়ি ফিরবো।

–না, আমি একা হাঁটতে চাই।

—একা হাঁটতে চাও? আমার সঙ্গ তোমার খারাপ লাগছে?

নিয়ামত রসুল হাঁটতে শুরু করে। মনে হয় এতক্ষণ গাছের গুঁড়ির যে সাপোর্টটা ওর দরকার ছিলো এখন আর সেটা দরকার নেই। ও নিজেকে মুক্ত করতে চায়। আফরোজা দু'কদম ওর সঙ্গে হেঁটে বলে, আচ্ছা, ঠিক আছে আমি বাড়ি ফিরছি। এই পলিউশনের মধ্যে আমার হাঁটতে ভালো লাগছে না। আমি বাড়ি যাচ্ছি। আর শোন, আমি কিন্তু আর বেশি দিন এই বাড়িতে থাকবো না। একটা ভালো এলাকায় বড় বাড়ি তুমি ভাড়া করবে। এমন ছোট জায়গা ছোট বাড়িতে থাকলে মন ক্ষুদ্র হয়ে থাকবে। সামনে বাচ্চাকাচ্চা হবে। ওদের আমি বড় পরিবেশে আরাম-আয়েসে বড় করতে চাই।

এসব শুনতে শুনতে নিয়ামত রসুল পায়ের গতি বাড়িয়ে দেয়। পেছনে তাকায় না। জানতে চায় না আফরোজা ফিরে যাচ্ছে, নাকি অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে আছে? ও পলিউশন ভরা বাতাস টেনে অনুভব করে ওর ভেতরটা বেশ ফ্রেশ লাগছে। কোথাও কোনো দুনীরি বোধ নেই।

পরদিন অফিস থেকে ফেরার পরেও দেখতে পায় আগের দিনের মতো টেবিলে একগাদা খাবার। ও সেদিকে এক পলক তাকিয়ে বেডরুমে ঢোকে। আফরোজা ঘরেই ছিলো। ওকে দেখে ড্রেসিং টেবিলের ওপর তে নতুন কেনা পারফিউমটা তুলে নিয়ে বলে, তোমার জন্য কিনেছি। সকালে দিলু-মিলু এলো। ওরা কেনাকাটা করতে গুলশান যাবে, তাই আমাকে নিতে এসেছিলো। আমি গেলাম। মিলুর কাছ থেকে টাকা নিয়ে পারফিউমটা কিনেছি। চার হাজার টাকা নিয়েছে। আর একটু ভালো কেনার ইচ্ছে ছিলো। টাকার জন্য পারলাম না। দেখো তো তোমার পছন্দ হয়েছে কি না?

-আমি এসব চিনি না।

–দেখোই না, দেখতে দেখতে চিনবে।

নিয়ামত রসুল আফরোজার চকচকে মুখের দিকে তাকায়। আশ্চর্য, কোনো কিছু ওকে আহত করে না। ও ক্রমাগত জালটা ফেলেই যাচ্ছে, তারপর একসময় ওকে টেনে তুলবে। ওর কৌশল নিয়ামত রসুলকে মুগ্ধ করে।

—কি হলো, তাকিয়ে আছ যে?

ইয়ে, মানে, একটা জিনিস জানতে ইচ্ছে করছে।

–কি?

–তোমার পূর্বপুরুষের কেউ কি জাল ফেলে মাছ ধরতো?

–মানে? আঁতকে ওঠে আফরোজা।

—মানে খুব সোজা। তেমন কেউ কি ছিলো যে নিপুণ জেলে, যার জালে ভরে উঠতো অজস্র রূপালি মাছ।

—এসব কি বলছো তুমি?

—হ্যাঁ, এটাও একটা দারুণ দক্ষতার কাজ, সবাই পারে না। কিভাবে জাল ফেলতে হবে বোঝে না। তুমি ভীষণ ভালো বোঝো আফরোজা।

–তুমি আমাকে অপমান করছে। বিয়ের পর থেকেই দেখছি আমার জন্য তোমার কোনো ভালোবাসা নেই। নিশ্চয়ই তোমার প্রেম ছিলো, তুমি সে প্রেমে ব্যর্থ। হয়েছে বলেই আমার সঙ্গে এমন আচরণ করছে।

—প্রেম? হো-হহা করে হাসে নিয়ামত রসুল।

–হাসবে না, হাসবে না বলছি। বলতে বলতে আফরোজা পারফিউমের শিশিটা ছুঁড়ে ফেলে। ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বরে বলে, এরপর তোমার কাছে একটা দামি শাড়ি চাইলে বলবে, আমার পূর্বপুরুষের কেউ তাঁতি ছিলো কি না।

–না, সেটা বলবো না।

–বলবে না?

–হ্যাঁ,বলব না। কারণ তাঁতিরা শাড়ি বানায়, কিন্তু পড়ে না। ওদের কৌশলের দরকার হয় না।

বলতে বলতে নিয়ামত রসুল বাথরুমে গিয়ে ঢোকে। দরজা বন্ধ করার আগে শুনতে পায় আফরোজা কাদছে। ঘাম-জলের মাখামাখির মতো ও কি বেঁচে থাকার অন্য কোনো মাখামাখি বের করবে? না কি এভাবেই আফরোজা কৌশল জানে, ও ঝগড়া করে না। অনবরত নিজের ইচ্ছেগুলোর কথা বলে যাচ্ছে। কিন্তু কতদিন বলবে? পরবর্তী কি দাঁড়াবে? ও সাওয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে থাকে। ভাবনা এগোয় না।

বাথরুম থেকে বের হলে দেখতে পায় আফরোজা চোখের জল মুছে ফেলেছে। টেবিলে বসে পাঁপড় ভাজা খাচ্ছে। ওকে দেখে স্বাভাবিক কণ্ঠে বলে, চা খাবে?

-আসছি।

নিয়ামত রসুল চুল আঁচড়ে, জামা গায়ে দিয়ে টেবিলে আসে। একট টুকরো পাঁপিড় তুলে নেয়। আফরোজা নিজের প্লেটে কাবাব নিয়েছে। ও হয়তো একটি একটি করে সব খাবে। নিয়ামত রসুল পাঁপড় খেয়ে চায়ের কাপটা টেনে নেয়। আফরোজা মুখ নিচু করে বলে, বিয়ের ছয় মাস হয়ে গেলো, কিন্তু আমাদের সম্পর্কটা দাঁড়ালো না।

–কারণ, শুরুতেই তুমি সম্পর্কের মধ্যে দুর্নীতি ঢুকিয়েছো। বলেছো, উপরি পাওনার জন্য তুমি আমাকে পছন্দ করেছো? শুধুই আমাকে নয়।

–তোমাকে নিয়েই ওটা আমার বাস্তব কথা। যা তুমি করতে পারো, তা করবে কেন?

—সেটা ভালো না মন্দ তা বিচার করতে হবে না?

—আমিতো বিচার করেছি। সেটা অবশ্যই ভালো। ভালোভাবে বাঁচতে হলে টাকার দরকার। আমি তোমাকে নিয়ে ভালোভাবে বাঁচতে চাই।

—জানতে চাও নি আমার আয় আছে কি না?

—ভালো জীবনের জন্য সবার আয় থাকে।

—তুমি যেটাকে ভালো বলছে, সেটাকে আমি ভালো বলতে পারছি না। সেটা দুর্নীতি।

নিয়ামত রসুল টেবিলের ওপর ঠক্ করে কাপটা রেখে চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়ায়। আফরোজা কিছু বলে না। কাবাব শেষ করে গাজরের হালুয়া প্লেটে নিয়েছে। নিয়ামত রসুল ড্রইংরুমে বসে সকালে পড়া কাগজটা চোখের সামনে মেলে ধরে। শুনতে পায় আফরোজা কাজের মেয়েটার সঙ্গে চিৎকার করছে। নিয়ামত রসুলের মনে। হয় ও এখন নিজের ভেতরে ক্রোধ এবং যাবতীয় শব্দ ছুঁড়ে ফেলছে। ছুঁড়ে ফেলা ওর কৌশল। ওভাবে প্রতিপক্ষকে দমন করা যায় না। নিয়ামত রসুল নিজের মনে হাসে। হাসতে হাসতে ছাদের দিকে তাকায় আশ্চর্য, দুটো টিকটিকি ওখানে সঙ্গমরত। নিয়ামত রসুল দৃষ্টি ঘুরিয়ে নেয়। আবার তাকায়। একই দৃশ্য আর নেই। ওদের জায়গা বদল হয়েছে, নিজেদের অবস্থান বদল হয়েছে। ওরা আগের জায়গা থেকে পুব দিকে সরে গেছে। ওরা অন্য ভঙ্গিতে যৌনসুখ উপভোগ করছে। দৃশ্যটি দেখতে ওর ভালো লাগছে এবং ও কাগজের আড়ালে মুখ রেখে দৃশ্যটি দেখে পুলকিত হতে থাকে। হঠাৎ ওর মনে হয় আজ রাতে কি মাদি টিকটিকিটির পেটে ডিম হবে। তারপর বাচ্চা। না, ও দু'হাতে কাগজটা খামচে ধরে। মাথাটা হেলিয়ে দেয় সোফার পিঠে। বিড়বিড় করে বলে, না কোনো বাচ্চা নয়।

রাতে আফরোজা ঠাণ্ডা স্বরে বলে, এতদিন তুমি আমাকে পিল খেতে বলেছ, আমি খেয়েছি। এখন আর খাবো না। আমি বাচ্চা চাই।

-না, তা হবে না। আমি বাচ্চা চাই না।

–কেন?

—আমার মনে হচ্ছে, তোমার আমার সম্পর্কের মধ্যে দুর্নীতি আছে।

–মানে? কি বলতে চাও?

–কারণ আমাদের সম্পর্ক শুধুই ভালোবাসাহীন প্রয়োজন। এই সম্পর্কের ভেতরে একটি শিশুকে আনার কোনো মানেই হয় না।

নিয়ামত রসুল আফরোজার উত্তরের অপেক্ষা করে। কিন্তু কোনো উত্তর আসে। ও পাশ ফিরে শোয়। অন্ধকারে আফরোজার মুখ দেখা যায় না। দেখতে পেলে ও কিছু একা ভেবে নিতে পারতো। এখন সে সুযোগ নেই। ও দু'চোখ বোজার আগে ভাবে, এভাবে কতদূর যেতে পারবো আমরা? কে নতি স্বীকার করবে? আফরোজা না আমি? পরমুহূর্তে আপন মনে হেসে নিজেকে বলে, আমিতো নয়ই।

The End

PDF by BDebooks.Com